প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসের সূচনা, ক্রমবিকাশ ও মুখ্য প্রবণতা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি খুব বেশি দিনের নয়। একশতাব্দীর কিছু বেশি সময় হলো এর জন্ম। সেই জন্মলগ্ন থেকেই উপন্যাস মানুষের বহুমুখী জীবনের প্রকাশ ঘটাতে চাইছে। আজ সে নানা শাখা-প্রশাখায় নিজেকে বিস্তারিত করেছে। জীবনের জটিলতাই তার মুখ্য উপজীব্য। যেমন বিষয়ভাবনায় তেমনি রচনার প্রকরণে অর্থাৎ বয়ন-পদ্ধতি ও ভাষা-ব্যবহারে এই জটিলতাই পর্ব থেকে পর্বান্তরে নিয়ন্তার ভূমিকা নিয়েছে। শুধু কাহিনী পরিবেশন করেই উপন্যাস শান্ত হচ্ছে না, পাঠকের মনে নতুন এক জগতের উপলব্ধি সঞ্চারিত করে দিতে চাইছে।

গল্প বলার প্রবৃত্তি হলো মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। মানুষের সৃষ্টির দিন থেকেই কাহিনীর উদ্ভব। ধীরে ধীরে মানুষের জীবনের সীমা বেড়েই চলল, সেই সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে পরিচিত হতে লাগলো। মানুষের চলার যেমন শেষ নেই তেমনি তার সুখ-উল্লাস ব্যথা-বিপর্যয়েরও শেষ নেই। বস্তুলোকের পরিধিকে মানুষ যতই প্রসারিত করে নিল, সেই পরিমাণেই তার মানসলোকের সীমা গেলো বেড়ে। মানুষের জীবন অনাদি এবং অসীম। স্বভাবতই এই অসীম, অনন্ত জীবনের গল্পও আদি-অন্তহীন। এই গল্পের একটা আরম্ভ ও শেষ আছে, আছে উত্থান-পতনের বিচিত্র তরঙ্গ। তবুও প্রকৃতপক্ষে তার শুরুও নেই, শেষও নেই। E.M. Forster একটি মূল্যবান কথা বলেছেন -

> "And a third man he says in a sort of drooping regretful voice, yes - oh dear yes - the novel tells a story ... and the third is my self".[১]

উপন্যাসের প্রধান বিষয় হলো গল্প বা কাহিনী। কিন্তু Forster বলতে চেয়েছেন যে গল্প বা কাহিনীই উপন্যাসের সবটা নয়, তার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, রচনা-কৌশল, শিল্প-নৈপুণ্য

ইত্যাদির পরিচয়ও আমাদের জানা দরকার। গল্প বা কাহিনী হলো উপন্যাসের মর্মবস্তু। কিন্তু কাহিনীকে ঔপন্যাসিক কিভাবে পরিবেশন করবেন এবং কি কি ঘটনার মাধ্যমে, কোন্ বিশেষ অবস্থা থেকে গল্প শুরু হবে এবং কোন বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে গল্প শেষ হবে, কাহিনীর কতখানি বলা হবে এবং তার স্থান-কাল-পাত্র কিভাবে সাজানো হবে, কাহিনীর কতটা বলা হবে এবং কতটা প্রচ্ছন্ন থাকবে, কি ভাষায় বলা হবে কাহিনী — এ সবই রচয়িতার উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বড় কথা, ঔপন্যাসিক কিভাবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে নিজের আয়ত্তে আনেন তার উপর নির্ভর করে তাঁর উপন্যাসের সার্থকতা।

কাহিনী বা গল্পের পরে যে বিষয়টি আমাদের নজর কাড়ে তা হলো চরিত্র। মানুষকে নিয়েই যখন কাহিনী বা গল্প তৈরি হয়েছে তখন উপন্যাসে চরিত্রের একটা বিশেষ স্থান আছে। আর প্রতিটি মানুষের আলাদা আলাদা সত্তা বিরাজমান। এই বিভিন্নতা তার আচারে ব্যবহারে, ভাবনা-চিন্তায়, কাজে কর্মে, প্রকাশিত হবেই। স্বভাবতই ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ন করবেন নিজস্ব সৃষ্টিতে। কেননা ঔপন্যাসিক হলেন জীবন শিল্পী, জীবনের নব-নির্মাতা।

অন্য একটি বিষয় হলো, উপন্যাস কিভাবে রচিত হবে বা ঔপন্যাসিকের চিন্তা-ভাবনা কিভাবে কাহিনী এবং চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছবে। এই বিষয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কিছু না কিছু বলতে চান। কিন্তু বলাটা যেমন তাঁর জরুরি, তেমনি কিভাবে বলবেন সেটা আরও বেশি জরুরি। আবার মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। ভাষা তাই মানব-মনের ভাবনা-চিন্তার ধারক ও বাহক। ঔপন্যাসিক যাই বলতে চান না কেন তিনি মূলত ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটান। আমাদের মনের বিচিত্র আলো-ছায়ার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়। সেই সমস্ত ভাব আবার কখনও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, কখনও আবার তা অবচেতন মনে প্রচ্ছন্ন থাকে। ফ্রয়েডের পরবর্তীকালে মানুষের অবচেতন মন নিয়ে নানা রকম

আলোচনা হয়েছে।বর্তমান যুগের সাহিত্যে শুধুমাত্র মানুষের সচেতন মনের পরিচয় দিলেই বক্তব্য শেষ হয়ে যায় না। অবচেতন মনের গুরুত্বও অনুধাবন করা প্রয়োজন। স্বভাবতই চেতন-অবচেতনের টানাপোড়েন প্রকাশে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। উপন্যাস সময়ের শ্রেষ্ঠ দর্পণ, সময়ের সূক্ষ্ম জটিলতা তার ভাষা ও গ্রন্থনার স্তরে-স্তরে নিহিত থাকে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সূচনা যদিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, আধুনিক গদ্যের উন্মেষের সঙ্গে তার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। আঠার শতকের শেষে বাংলা গদ্যের দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলেও তার কোনো শ্রী বা ছাঁদ ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের তাগিদে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। আধুনিক গদ্যের গোড়াপত্তনের ক্ষেত্রে ঐ কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর অবদান স্মরণীয়।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ বাংলা গদ্যের উন্মেষ-পর্বে যেসমস্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছিলো তাদের যদি তালিকা তৈরি করি, তাহলে তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালি পাঠকও লেখকদের মানসিকতার পরিচয় পাব,তৎকালীন পাঠক সমাজ মুখে মুখে গল্প শুনতে ভালোবাসত। ফলে খুব বেশি গল্প লেখা হয়নি। এর মধ্য দিয়ে লেখক ধর্ম ও নীতি প্রচারে খুব বেশি মনোযোগ দিতেন। কিছু অনুবাদ-মূলক সাহিত্যও পাওয়া যায়। আর যে কয়টি উপন্যাস পাওয়া যায় তাতে ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এদেশে কর্মরত ইংরেজদের বাংলাভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে কলকাতার লালবাজারের কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই কলেজের বাংলাভাষার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক কেরী সাহেব বাংলা পড়াতে গিয়ে ভীষণ অসুবিধায় পড়েন। আর এই অসুবিধা কাটানোর জন্য তিনি সহজ বাংলায় লেখা গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হলেন। কেরীসাহেব

নিজে বাংলা গদ্য গ্রন্থ লিখলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের দিয়ে বই লিখিয়ে নিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামরাম বসু প্রণীত 'রাজা-প্রতাপাদিত্য চরিত্র'(১৮০১) বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। ফারসী গ্রন্থ থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত করে তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় রামরাম প্রথম লেখক হিসেবে বেশ খানিকটা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে যথার্থ ভাষা-শিল্পী হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। পরিচ্ছন্ন সাধুভাষার রূপনির্মিতির স্রষ্টা হলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ'। তাহলে বলা যায়, কেরীসাহেব ও তাঁর সহকর্মীগণ বাংলা গদ্যের যথার্থ রীতি কি হবে এ-নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, কিন্তু এঁদের দ্বারা বাংলা গদ্যের রীতি নির্ধারিত হয় নি। এর পর রাজা রামমোহন রায়ের রচনার মধ্যে সর্বপ্রথম মননের সুতীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যকে অনুবাদ, আলোচনা, বিতর্ক ও মীমাংসার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে কাহিনী ও গল্প প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু রামমোহন একে যুক্তিতে, তর্কে, চিন্তায় নিয়োজিত করলেন। কি করে বাংলা পড়তে ও লিখতে হয় এ যেন তিনি বাঙালি জাতিকে হাত ধরে শেখালেন। রবীন্দ্রনাথ রামমোহন রায় সম্বন্ধে বলেছেন যে রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা, সমাজ, ভাষা, — আধুনিক বঙ্গদেশের এমন কিছুই ছিলো না যা রামমোহন রায় স্বহস্তে সূত্রপাত করেন নি। এর সঙ্গে সাময়িক পত্রের প্রকাশের ফলে বাংলা গদ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এই পর্বেই অক্ষয় কুমার দত্ত এবং ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো গদ্য নিবন্ধকারের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির চর্চা লক্ষ করা যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক না হলেও শিল্পসম্মত গদ্যরীতির নির্মাতা। তাঁর মৌলিক রচনার সঙ্গে অনুবাদ গ্রন্থগুলির পরিচয় নিলেই এই গদ্য রীতির সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। নিছক সাহিত্য সৃষ্টির চেয়ে

লোকহিত সাধনে সাহিত্যের ব্যবহার সমস্ত শিল্পচেতনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে বিদ্যাসাগর মনে করেন। বাঙালির গদ্য সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি ও শিক্ষা প্রচার কল্পে তাঁর মৌলিক রচনা-শক্তিকে সংহরণ করে, সমস্ত প্রতিভাকে অনুবাদ কার্যে নিয়োগ করতে হয়েছিলো। তবে তাঁর মৌলিক রচনাও কম নয়। সে যাই হোক, বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে, পদবন্ধে ভাগ করে এবং সুললিত শব্দ বিন্যাস করে বিদ্যাসাগর তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় রূপান্তরিত করেন। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে ধ্বনি-ঝঙ্কার ও সুর বিন্যাস সম্ভব তা তাঁর পূর্বে কেউ জানতে পারেন নি। তাঁর প্রচলিত সাধুভাষাই প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বাঙালির লেখনীর ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য -

> "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন - এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন - কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।" [২]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ আধুনিকতার সূচনা হয়ে গেছে। বাঙালির জীবন ও সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে চৈতন্যের বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, গদ্য সাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখা যায়। কেশবসেনের 'ভারত সংস্কার সভা'য়(১৮৭০) গণতন্ত্র ও স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করা হলো, নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা'(১৮৬৭), মনোমোহন বসুর - জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত, বঙ্কিম চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', আধুনিক যুবকদের 'ভারতীয় বিজ্ঞান সভা'(১৮৭৬) ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির রাষ্ট্র চেতনার এক নতুন যুগের সৃষ্টি হলো। এর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলনের তাৎপর্য ও স্মরণীয়। এই সময়ের গদ্য শৈলীর বিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর এঁরা প্রভূত^স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এভাবেই উনবিংশ শতাব্দীতে গদ্য-সাহিত্যের উদ্যমের বিকাশ হয়েছিলো। এই সময় তাই মনন ও সৃজনী কল্পনার নিত্যনতুন দিগন্ত বিস্তারের যুগ। উপন্যাস এই আলোড়ন ও সম্ভাবনার অন্যতম যুগন্ধর প্রতিনিধি।

উপন্যাস সৃষ্টির লগ্নে বাংলাদেশে তথা কলকাতায় নানা ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কলকাতার কথা উঠে এই কারণে যে লেখকগোষ্ঠী কলকাতার ভাবরসে পরিশীলিত, এবং এখানেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। কলকাতায় ঐ আদর্শে তৈরী শহরতলীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই–বিশেষ করে যারা চাকুরিজীবী, তারাই এই সাহিত্যের পাঠক, শ্রোতা এবং লেখক। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন পরস্পর-বিরোধিতায় উত্তাল।

নবাবী আমলের শেষার্ধে এবং কোম্পানী আমলের শুরুতে বাংলাদেশে একটা পরিবর্তন সর্বত্রই লক্ষ করা যায়।

> "সমাজের জীবনে যখন আত্মবিকাশ থেমে যায় তখন আসে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের যুগ, আমাদের সাহিত্যে যাকে মাৎস্যন্যায় বলা হত আর টয়েন্‌বি যার নাম দিয়েছেন 'times of trouble'.[৩]

সামন্তবাদী ভাবসংস্কারকে অক্ষুন্ন রেখেই তার উপর জায়মান ধনতন্ত্রের জীবনাদর্শ আরোপিত হলো। ফলে মধ্যযুগের মানসিকতার উপর আধুনিকতার মধ্যেও রয়ে গেলো নানা ধরনের দোলাচল ও পিছুটান, দ্বিধা ও আত্মখন্ডনের বীজ। ক্রমে এক নতুন অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্মেষ হলো। গ্রামীন ভূমি-নির্ভর অর্থনীতির উপর রচিত হলো ইস্ট – ইন্ডিয়া কম্পানির বাণিজ্যের অধিকার।

> "It was on the 31st December, 1600, that the first important step towards Englands' Commercial Prosperity was taken. On that memorable day the East India Company received a charter from Queen Elizabeth granting it the monopoly of eastern trade for fifteen years."[8]

ভারতের এই আমূল পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে কাল্‌মার্কস্‌ বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডকে একই সঙ্গে দুটি কাজ করতে হবে - একটি ধ্বংসমূলক, অপরটি পুনরুজ্জীবন-মূলক। প্রাচীন এশীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন পাশ্চাত্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করাই হলো ঔপনিবেশিক শক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই কাজের ফলশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন -

> "All the English bourgeoisie may be forced to do what will neither emancipate nor materially mend the social condition of the mass of the people, depending not only on the development of the Productive Powers, but on their appropriation by the people. But what they will not fail to do is to lay down the material premises for both. Has the bourgeoisie ever done more ?"[৫]

ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঢেউ কার্ল্‌মার্কস্‌ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। ভারতের মাটিতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঝোঁক উনবিংশ শতকের গোড়াতেই লক্ষ করা গেছে। ব্রিটিশ যুগের বাণিজ্যিক অর্থনীতি ক্রমে-ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে হলো পুঁজি-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের ধারা ও মানবতাভিত্তিক দার্শনিক মননশীলতা ধীরে ধীরে বাংলার সমাজে এলো। স্বভাবতই শুরু হলো সংস্কৃতির রূপান্তর, বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিলো ভাববিপ্লব। নব্য শিক্ষিত বাঙালির মানস-লোকে দেখা দিলো আত্মসচেতনতা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠায় তারা আগ্রহী। সৃষ্টি হলো প্রাচীনপন্থীর সঙ্গে নব্য শিক্ষিতের সংঘাতের বাতাবরণ।

"ইতিহাসের প্রথম কথাই হল পরিবর্তন। ... সকল রকমের সনাতনী রক্ষণশীলতার সাধারণ লক্ষণ এই গতিকে অস্বীকার করা, ইহাকে দেখিয়াও না দেখিবার চেষ্টা। ... অন্যদিকে পরিবর্তনের অর্থ পুরাতনের সঙ্গে সকল যোগ ছিন্ন হওয়া নয়। আগের অবস্থা রূপান্তরিত হইয়া চলে, কিন্তু নূতন ব্যবস্থার সঙ্গে পুরাতনের কিছু সম্পর্ক থাকিয়া যাওয়া অস্বাভাবিক নহে। উগ্র চরম-পন্থীরা এই সহজ কথাটা বুঝিতে চাহে না।" [৬]

বাংলার এই পরিবর্তনকে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায় - (১) রামমোহন - বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সংস্কার প্রচেষ্টা। (২) ইয়ংবেঙ্গল দলের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবেগময় অনুচিকীর্ষার আত্যন্তিকতা এবং (৩) রক্ষণশীল দলের প্রাচীনত্বের সংরক্ষণ-প্রয়াস। কিন্তু প্রধান দ্বন্দ্ব হলো প্রাচীন ধারার পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে নব্য চেতনার সামাজিক প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। তবে রামমোহন দল এবং ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী উভয় দলই নবভাবধারায় গঠিত। প্রথম দলের মধ্যে আমরা যে মানসিকতার পরিচয় পাই তা হলো সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনা কিন্তু দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবাবেগের প্রাবল্য লক্ষ করি। একদিকে তীব্র স্বাজাত্যাভিমান, অন্যদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মানবিক যুক্তিবাদ - এই দুই মানসিকতা একদিকে যেমন তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্বেলিত করেছিলো তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মূলে আঘাত হেনেছিলো। এর প্রকাশ আমরা তৎকালীন নাটক, কাব্য, ব্যঙ্গ-প্রহসনের মধ্যে দেখতে পাই। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য চিন্তা ও সংস্কার চিন্তা ছিলো একে অপরের পরিপূরক। রামমোহনের 'বিচার', 'বেদান্তগ্রন্থ,' 'বেদান্তসার' ইত্যাদিতে যেমন তাঁর ধর্মচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে তেমনি 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ (১ম ও ২য়) গ্রন্থে রয়েছে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অন্যদিকে রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বাংলার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে উৎসাহী হলেন। তাঁর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি লক্ষ রেখে বিনয় ঘোষ বলেছেন -

"উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগর চরিত্রে এই সমাজ চেতনা ও ব্যক্তি চেতনার সংযোগের ফলে নবযুগের বাংলার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল। তিনিই প্রথম সেই সমাজ চেতনাকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে social reality তে পরিণত করবার চেষ্টা করেছিলেন।" ৭

তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে সমাজচিন্তা ও মানব-মুক্তির প্রয়াস পর্যালোচনা করা আছে। তিনি আজীবন শিল্পকে যুগোপযোগী করার সচেষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী জি, টী, মার্শালকে যে আবেদন পত্র পাঠান হয় তাতে ঈশ্বর চন্দ্রের স্বাক্ষর ছিলো। ঐ আবেদন পত্রের উপসংহারটুকু হলো -

"... অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপূর্বক রীত্যনুসারে আমাদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্যনির্বাহে সমর্থ হইতে পারি।" ৮

এর পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর (২২ জানুয়ারী ১৮৫১) সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠন সম্পর্কে ডাঃ জে, আর, ব্যালেন্টাইনের সুপারিশের প্রতিবাদ করে তদানীন্তন সেক্রেটারী ডাঃ ময়েটকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।

"ডাঃ ব্যালেন্টাইনের নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক প্রচলন বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ... ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য-দর্শনের তিনখানি পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিয়াছেন। 'বেদান্তসার' পূর্ব হইতেই পাঠ্য রূপে সংস্কৃত কলেজে গৃহীত, ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়ান যাইতে পারে।' কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবিত ন্যায় সম্বন্ধীয় 'তর্ক সংগ্রহ' এবং সাংখ্য-সম্পর্কিত 'তত্ত্বসমাস' নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্য সূচীতে উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুস্তকের নির্দেশ আছে। ... বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এগুলি শিখাতেই

হইবে, ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধক রূপে ইংরেজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। ... হিন্দু শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মত একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে। ... দেখা যাইতেছে, বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র। দেশীয় পন্ডিতদের মনস্তুষ্টি না করিয়াও আমরা কি করিতে পারি, তাহা দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাই আমাদের শিখাইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার - ইহাই এখন আমাদের আয়োজন।" ১

প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর একজন আধুনিক বাংলার রূপকার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটবে, ফলে মানুষের মধ্যে আধুনিক মানবমুখীন চেতনার বিকাশ হবে। সেই সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্নতা সমাজের বুক থেকে সরে যাবে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে আর বাধা আসবে না। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসন, মধুসূদনের কাব্য ও প্রহসন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য ইত্যাদিতে তৎকালীন সমাজ-চেতনা যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ব্যক্তির মানস-চেতনাও উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্যে এত বেশি যে তারা নিজেদের ধরে রাখতে পারেনি। নানা রকম উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে রক্ষণশীল সমাজ ধর্মের নামে কুরুচিপূর্ণ রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সেই সঙ্গে নববাবু শ্রেণীর উৎকট বিলাসিতাপূর্ণ জীবন-যাপনের ফলে সমাজে সাংস্কৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। চারিদিকে একটা অস্থির অবস্থা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ-এর উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ —

"নবযুগের সমাজে অহং-সর্বস্ব ব্যক্তির আবির্ভাব হলো যখন, তখন তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠলেন তাঁরা। সাহিত্যেও তার প্রকাশ ঘটল। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ভবানীচরণ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ পর্যন্ত তার একটানা স্রোত বয়ে গেছে। এই বিদ্রূপের জোয়ারের মধ্যেই প্রথম বাংলা গল্প উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।" ১০

সমাজের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ব্যঙ্গ-জাতীয় রচনা ও নক্সার আবির্ভাবের ফলে উপন্যাস সৃষ্টির পথ আরও সুগম হলো। তবে আমাদের দেশে উনিশ শতকের পূর্বে সাহিত্যে ব্যঙ্গ-রসাত্মক বা সমাজ-সমস্যামূলক রচনা ছিলোনা, তা নয়। সেগুলি ছিলো মূলতঃ পদ্যের ভাষায় কবিওয়ালাদের গানে বা টপ্পায়। মুদ্রণযন্ত্র উপযুক্ত গদ্যভাষা, সাময়িক পত্র ও নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না হওয়ার ফলে তৎকালীন সমাজে নক্সা বা ব্যঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। উনিশ শতকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই কলেজের প্রতিষ্ঠার পর বাংলা গদ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত হলো। ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে সমাচার দর্পণ, দিগ্‌দর্শন, সম্বাদ-কৌমুদী, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-প্রভাকর ইত্যাদি পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে মুদ্রণ শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছিলো। নাগরিক সভ্যতার বিকাশে ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবে সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধগুলির প্রতি সংশয় দেখা দিলো; অপরদিকে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর অনুগ্রহপুষ্ট কিছু ব্যক্তি সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার পর অত্যধিক বিলাস ব্যসনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। এই শ্রেণীর লোকেরাই 'বাবু' সম্প্রদায় নামে পরিচিত। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই 'বাবু' সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন -

"তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগ-সুখেই দিন কাটাইত। ... মুখে, ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে

ফিন্‌ফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেম্‌রিকের বেনিয়ান, গল-দেশে উত্তম রূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস্‌ সমন্বিত চীনের বাড়ীর জুতা। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বীন প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ্‌ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীত বাদ্য ও আমোদ করিয়া দিন কাটাইত ..."।[১১]

এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা তৎকালীন যুবসমাজ প্রভাবিত হয়েছিলো, যে বালক অভিভাবক-হীন অবস্থায় এসে কলকাতায় পড়াশুনা করত, অল্পদিনের মধ্যে এরা 'বাবু' সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে -

"বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিতে কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত, এবং অনেক সময় তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।"[১২]

এই দোষগুলি শুধুমাত্র বালকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও এই দোষগুলি দেখা দিত।

"তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তা-রের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। ... যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন।"[১৩]

স্বভাবতই তৎকালীন সাহিত্যিকরা বিত্তবান বাবু-সম্প্রদায়ের জীবনাচরণের মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের প্রচুর উপাদান খুঁজে পেলেন ফলে তাঁরা স্যাটায়ারধর্মী সাহিত্য লিখতেন। এই

স্যাটায়ার-ধর্মী সাহিত্যের পাঠক যেমন প্রচুর ছিলো অন্যদিকে এগুলি প্রকাশে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেত। আবার রক্ষণশীল সমাজের ব্যক্তিরাও সংস্কারপন্থীদের ও ইয়ং—বেঙ্গলের কাজকর্ম পছন্দ করতেন না। তেমনি ব্রাহ্ম, হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিরোধ ছিলো তীব্র, একে অন্যকে আক্রমণ করবার জন্য স্যাটায়ারের আশ্রয় নিত। এই কারণেও ব্যঙ্গ ও নক্সা জাতীয় রচনার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর উল্লেখ করে বলেছেন -

> "দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অনুসৃত ধর্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার যখন আক্রমণের বিষয়ীভূত হয়, তখন আলোচনার ধারা যুক্তিতর্কের মন্থর প্রণালী ছাড়াইয়া হৃদয়াবেগের বেগবান প্রবাহের সহিত সংযুক্ত হয় ... তথ্য-বিচার সাহিত্য পদবীতে উন্নীত হয়। ব্যঙ্গ বিদ্রুপশ্লেষের মার্জিত দীপ্তি ও শাণিত তীক্ষ্ণতা এই মানস উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ যুক্তি তর্কের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যালোকপৃষ্ট বর্শাফলকের মত ঝলকিত হয়। এই শ্লেষপ্রধান মনোভাব ক্রমশঃ আশু প্রয়োজনীয়ের সংকীর্ণ গন্ডি ছাড়াইয়া নিরপেক্ষভাবে সমস্ত সমাজ জীবনের উপর বিস্তৃত হয়। সমাজ জীবনের ব্যাধি বিকার, অতিশয্য-অসঙ্গতির প্রতি মন সহসা সচেতন হইয়া ওঠে, এই নবজাগ্রত দেবতার জন্য বলি খুঁজিয়া বেড়ায়। সম-সাময়িক সামাজিক অবস্থার শ্লেষাত্মক পর্যবেক্ষণ ও ইহার হাস্যোদ্দীপক, বিসদৃশ দিকগুলির ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন উপন্যাস রচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর।" [১৪]

ঔপনিবেশিক সমাজের সুবিধাভোগী ও ছিন্নমূল মানুষেরা যতই মূল্যবোধের প্রতি উদাসীন থেকে সামাজিক কর্তৃত্ব দখল করতে লাগলেন, সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকলো না। ইংরেজ আরোপিত আধুনিকতার চাপে সাধারণ বিবরণমূলক গদ্য এই পর্যায়ে যখন কাহিনীমূলক গদ্যে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সে-সময় উপন্যাসের উপযোগী বিষয়বস্তু বা আঙ্গিক প্রচলিত ছিলো না। গদ্য লেখকেরা যদিও উপযুক্ত মডেলের সন্ধান করছিলেন, জীবন থেকে

ক্রমশ নানা ধরণের উপকরণ আহৃত হচ্ছিল - উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে উনিশ শতকের ষাটের দশকে। এর আগে বাস্তবতার সন্ধান ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও পরিহাস-প্রবণতার মধ্যে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ঔপন্যাসিক কিভাবে ও কোন ভাষায় ঘটনার বিবরণ দেবেন এবং বিভিন্ন চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক ও টানাপোড়েন প্রকাশ করবেন — ঔপনিবেশিক জীবনের সীমাবদ্ধতার ফলে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা খুব সহজ ছিলো না। সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের ঐতিহ্যে নতুন জীবনবোধের প্রকাশ অসম্ভব বিবেচিত হওয়াতে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিক হয়ে উঠলো বিশ্বাসযোগ্য ও একমাত্র মডেল।)

সময়-বাহিত অভিজ্ঞতার পরিশীলিত হয়ে নিশ্চরিত্র কেজো বাংলা গদ্য যখন ক্রমশ পরিণত হলো, সৃজনী উত্তাপ ধারণের ক্ষমতা অর্জিত হলো তখনই। পাঠ্যপুস্তক ও নীতিগর্ভ রচনা প্রণয়নের মধ্য দিয়েই বাংলা গদ্যে শক্তি ও শ্রী দেখা দিয়েছে। ঘনিয়ে এলো উপন্যাস রচনার লগ্ন। উপন্যাস এমন একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-মাধ্যম যা তার জন্মলগ্নেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদের সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। বঙ্গীয় নবজাগরণের মর্মবাণী যে মানব-কেন্দ্রিকতা, তাই উপন্যাসের প্রেরণা। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যেত জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ নেই। কোনো একজন দেবতা বা দেবী এবং তাঁদের পুজো প্রচারের মধ্য দিয়েই জীবনের সব উদ্দেশ্য চরিতার্থ হতো। মানুষের জীবন ছিলো যেন চড়া রং-এ আঁকা; কেউ পাপী, কেউ পুণ্যবান, উপরে থাকত একজন রাজা, রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা হতো, রাজা যা বলেছেন সেটাই আইন - সেখানে গোষ্ঠীই বড়ো ছিলো, ব্যক্তি বড়ো নয়। নবজাগরণ যে মানব-কেন্দ্রিকতা নিয়ে এলো, তাতে মূল্যবোধের কাঠামো আমূল পাল্টে গেলো, ফলে কাহিনীও বদলে গেলো। চরিত্র-চিত্রণে নতুন ধারার প্রবর্তন হলো, উপন্যাস সাহিত্যে দেখা দিলো আধার এবং আধেয়ের দ্বান্দ্বিকতা।

সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের প্রভাব তাঁর উপন্যাসে বড়ো বেশি স্পষ্ট। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আইভেনহো

বা স্কটের কথা অনেকেই বলেন। পরবর্তীকালে তিনি যে উপন্যাসগুলো লিখলেন, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস, পারিবারিক উপন্যাস ইত্যাদি নানা ধরনের উপন্যাসে বিদেশী প্রভাব আমরা লক্ষ করি। এই প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক - দুরকমই হতে পারে। ঔপনিবেশিক সমাজে এই প্রভাবের রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে; শাসকের সাংস্কৃতিক চেতনার মান স্পর্শ করার সচেতন আকাঙ্ক্ষা শোষিতের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। উপন্যাস যখন প্রথম রচিত হতে শুরু করে তখন তার ফর্ম দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেনি। স্বভাবতই যাঁরা প্রথমদিকে উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের ফর্ম নিয়ে অনেক ভাবতে হয়েছে। তাঁরা কোন পথে এগোবেন সে পথ তাঁদের অজ্ঞাত ছিলো, ফলে তাঁরা একাধারে আবিষ্কারক এবং স্রষ্টা। কিন্তু পরবর্তীকালের উপন্যাসে আবিষ্কারকের ভূমিকা ততটা থাকলোনা। তাঁরা যে সৃষ্টির ধারা গড়ে তুললেন তার মধ্যে কথাবস্তু ও বয়নরীতি নির্বাচনের একটা সচেতন ভূমিকা ছিলো। কিভাবে লেখা হবে ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হবে, বর্ণনার রীতি বা চরিত্র-চিত্রন কেমন হবে, এটা বাহ্যিক দিক। আবার ব্যক্তিসত্ত্ব কিভাবে প্রকাশিত হবে, সময় এবং সমাজের টানাপোড়েন কিভাবে ব্যক্ত হবে —সেটা মৌলিক ভাবনার দিক। এই দিকগুলো নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতেই উপন্যাস এগিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ভারতীয় এবং বাঙালি সমাজে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাঙালি সমাজে যে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিলো তাতে ক্রমশ পরিবর্তন সূচিত হলো। আমাদের দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের ছত্রছায়ায় মধ্যবিত্ত সমাজ তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নিয়েই উপন্যাসে স্থান করে নিয়েছে। উপন্যাসের শিল্পরূপ মূলত মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্ববিক্ষত জীবন ভাবনারই অভিব্যক্তি এবং মধ্যবিত্ত জীবনের সীমাবদ্ধতার অমোঘ প্রভাবে উপন্যাসের জন্ম লগ্নেই সীমাবদ্ধতা প্রবল হয়ে উঠলো। উপন্যাস বাস্তবতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব সামাজিক বাস্তবতার চাপে তার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বারবার। বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখছেন তখন তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অনুশীলন করেই লিখেছেন। কিন্তু তবু সামাজিক অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা

111107
24 MAY 1994

তিনিও অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু রেনেশাঁস যেহেতু খণ্ডিত, সেইজন্য রেনেসাঁসের আলো সমানভাবে সবাই পায়নি। কলকাতা শহরের আশে পাশেই ছিলো বহু শতাব্দীর জমানো অন্ধকার এবং সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জনসাধারণ বলতে যা বুঝি এদের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো সম্পর্কই ছিলোনা, বরং বিচ্ছেদ ছিলো অনতিক্রম্য। ফলে বহমান নব্যজীবনের স্পন্দন সাধারণ মানুষ নিজেদের অন্তরে কতটুকু অনুভব করেছিলেন তা বলা শক্ত। লেখকরা কল্পনা দিয়ে বাস্তবের অপূর্ণতাকে পূরণ করার জন্যে ধূপ-ছায়ার বলয় তৈরী করেছিলেন। তবে যুগবাহিত অন্ধকার তাতে দূর করা যায় নি। ফলে আলো এবং অন্ধকারের সীমারেখাটা প্রায়ই ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে। উপন্যাস কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই অগ্রসর হয়েছে, তার চরিত্রে দেখা দিয়েছে বিচিত্র জঙ্গমতা, নবোদিত মধ্যবিত্ত বর্গের মধ্যে দেখা গেছে স্থিতাবস্থার প্রতি পক্ষপাতিত্ব, আবার ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই বর্গের আলোকপ্রাপ্ত অংশের মধ্যে দেখা গেছে দ্বিমেরু-বিষম মনোভঙ্গি: একদিকে সংস্কারমূলক উদ্যমের প্রতি উৎসাহ আবার অন্যদিকে আমূল পরিবর্তনের প্রতি অনীহা। এই দোলাচল ঔপনিবেশিক সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রতিক্রিয়ার গোত্র-লক্ষণ। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশবাদ আরো অনেক শিকড় ছড়িয়েছে।

ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ধর্মীয় সংস্কারের হাত ধরে সমাজ-সংস্কার এসেছে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তারও উন্মেষ ঘটেছে। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের আবির্ভাব চেতনার আলোড়নের অন্যতম প্রমাণ। আবার এই সময় ঐতিহ্য-চেতনা পথভ্রষ্ট হয়ে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের চোরা-বালিতে তলিয়ে গেছে। ধর্মচিন্তা, সমাজবোধ ও সাংস্কৃতিক মননে বহুরৈখিকতা এবং রাজ-নৈতিক অনুভূতির উন্মেষ উপন্যাসে মাত্রান্তর সূচিত করেছে। ঊনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে অস্থিরতাও অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে সমস্ত ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় — সাহিত্যেও স্বভাবত এই প্রবণতা রূপ পেয়েছে। উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যেন পথিকের পথ হারানোর রূপকই রচনা করে গেছেন। দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম শুধু বঙ্কিমের নয়, উপন্যাস শিল্পেরও পথভ্রষ্টতার নিদর্শন। রমেশচন্দ্র দত্তের বুদ্ধিজীবী সত্তা তাঁর ঔপন্যাসিক অবস্থানকে আচ্ছন্ন

করেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আকাশবিহারী উপন্যাস-শিল্পকে ভূমিসংলগ্ন করতে চেয়েছেন কিন্তু সময়-স্বভাবের অনুশীলন তাতে নেই। ত্রৈলোক্যনাথ লোকায়ত অনুপুঙ্খ ও ঐতিহাসগত কথা-বয়ন দিয়ে বিকল্প শিল্পাদর্শ সন্ধান করেছেন। তাঁর ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতা, সমসাময়িক ঔপনিবেশিক সমাজবীক্ষণ রীতিকে পরাভূত করতে চেয়েছে। কিন্তু যথার্থ রূপকল্প ও প্রযুক্তির অভাবে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি।

এই প্রেক্ষিতেই ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকেই কিছু কিছু উপন্যাস লিখতে শুরু করে ছিলেন। তবে তাতে বঙ্কিমের ছায়া খুব স্পষ্ট। কিন্তু যখন বিশ শতক এলো, সে সময় নতুন সমাজ-বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বাঙালি সমাজ নানা ভাঙন এবং অস্থিরতার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের মতো বিপুল প্রতিভাশালী স্রষ্টা দেখালেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ, মূল্যবোধ এবং প্রকরণ যথাযথ নয়। নতুন বাস্তবতার দাবিতে নারীব্যক্তিত্ব বদলে গেলো সবচেয়ে বেশি। নারী সমাজের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ করি সেটা মূলত আদর্শায়িত, কিছুটা ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তি তাতে দেখি। উনিশ শতকের নারী-পুরুষের সম্পর্ক সামন্ততান্ত্রিক দ্বিধা, ভাবাদর্শ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত। দোলাচল, সংশয় পেরিয়ে নারী কৃচিৎ ব্যক্তি হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আমরা বাস্তবতা ও কল্পনার অন্তহীন টানাপোড়েনই লক্ষ করি। এই টানা-পোড়েনের এক ধরনের অভিব্যক্তি দেখি কপালকুণ্ডলা ও দুর্গেশনন্দিনীতে যার বিপরীত মেরুতে রয়েছে ইন্দিরা, সেখানে কল্পনা প্রাগুক্ত উপন্যাস দুটির মতো বাস্তবাতি-যায়ী নয়। ইন্দিরার মধ্যে লঘু কল্পনা (বা ফ্যান্সি) বাস্তবকে বিশিষ্টতা দেবার জন্যেই তার অনুগামী হয়েছে। নারী যে পুরুষের প্রণয়ভাগিনী মাত্র নয়, তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব রয়েছে —বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরার মতো লঘু-বিহারী রচনায় এই মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

স্বামীকে ব্যক্তিত্ব দিয়েই জয় করে নিয়েছে ইন্দিরা, যদিও তার পথটি তির্যক। এই পথসন্ধানের রূপকমূল্য সামান্য নয়, গন্তব্য পূর্ব নির্ধারিত হলেও তার গুরুত্ব কমে যায় না।

উনিশ শতক থেকেই ঔপন্যাসিকদের প্রধান উপজীব্য যদিও মানুষের হৃদয়রহস্য, সামন্ততান্ত্রিক নীতিবোধের প্রাবল্যে তা প্রায়ই আচ্ছন্ন। রমেশচন্দ্র তারকনাথ — কেউই এই প্রবণতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। ফলে বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের টানা-পোড়েনের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট জটিলতার সামগ্রিক তাৎপর্য সর্বদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ছত্র-ছায়ায় প্রথম দিকে বিকশিত হলেও বিবর্তনশীল মূল্যবোধের অমোঘ প্রেরণায় নিজস্ব পথ নির্মাণে যত্নবান হয়ে উঠলেন। 'বউঠাকুরাণীর হাট'এর পরে 'চোখের বালি'র মধ্যে নিজেকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করলেন যেন। সেই আবিষ্কারের ফলে নারী নতুন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলো, আপন হৃদয় ও অনুভূতির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা-টা সহজ হয়নি যদিও। কিন্তু প্রতিবাদী চিত্তবৃত্তির ঘোষণা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। নারীর প্রেম-ভাবনা এই পর্যায়ে তার ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের প্রবল মাধ্যম, কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থান জনিত গ্রন্থিলতার প্রভাবে তীব্রতর সংকটেরও কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী চরিত্রের মধ্যে যে প্রতিবাদী জীবন-ভাবনার সূচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রের মধ্যে তার আরো একটু বিস্তার দেখলাম, কিংবা 'চার-অধ্যায়ের' এলা, 'চতুরঙ্গ'র দামিনীর মধ্যে যেন নারীব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য ও শৌর্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এইভাবে দেখা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বাংলা উপন্যাস নানা ধারায় বিকশিত হতে শুরু করেছে এবং তার প্রধান হোতা, সাহিত্যের অন্যান্য দিকের মতো, রবীন্দ্রনাথ — এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক সমাজভাবনার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ আরো বেশি স্পষ্ট। যেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথও দৃষ্টিপাত করতে পারেন নি, কিংবা বলা যায় তার অবকাশ হয়নি — শরৎচন্দ্র সেদিকে মনোযোগী হলেন। গ্রামীন সমাজের নির্মম

কঠোর বাস্তবতার আলোয় মানবিক সম্পর্কের নতুন তাৎপর্য উদ্ঘাটনই হয়ে উঠলো তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র। সামান্যের মধ্যেও তিনি খুঁজে পেলেন অসামান্যকে। অপরিসীম সহানুভূতি নিয়ে তিনি নারীর মহিমাময়ী ভাব প্রতিমা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। তবে আদর্শায়িত কল্পমূর্তি গড়তে গিয়ে শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মাত্রাকে ঝাপসা করে দিয়েছেন - একথা পাঠকের মনে আসে। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ এর দ্বৈততাও তাঁর রচনায় ছায়াপাত করেছে, কিন্তু সর্বদা সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। ফলে তাঁর বহু সম্ভাবনাময় উপন্যাস শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধিতে পৌঁছয় নি। সমাজের অভ্যন্তরে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জায়মান ধনতান্ত্রিক জীবন-বোধের দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্র লক্ষ করেছিলেন, শিকড়হীন ঔপনিবেশিক সমাজের দোলাচল মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। শরৎচন্দ্র কিন্তু কখনই, ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যে নতুন ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিলো - তার পক্ষে যাননি। তাঁকে আমরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পক্ষপাতী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এর ফলে উপন্যাসে আবেগের তরলতা পরিলক্ষিত হয়।

পরবর্তীকালে কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা আধুনিকতার খুব বড়ো তরঙ্গ লক্ষ করি। সমাজের যারা অবজ্ঞাত, নিচু-তলার লোক তাদের কাছে তাঁরা পৌঁছাতে চেয়েছেন। কিন্তু এও আমরা দেখতে পেয়েছি যে রোমান্টিকতার বশবর্তী হয়ে বাস্তবতাকে তাঁরা খানিকটা ধোঁয়াটে করেছেন। শিল্পবোধ এবং বক্তব্যের টানাপোড়েনে তাঁরা প্রায়ই পদস্খলিত হয়েছেন, বাস্তবতার নামে নরনারীর দৈহিক সম্পর্কগুলোকে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁরা খানিকটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।

সামাজিক জীবনে যখনই পরিবর্তনের সূচনা হয় পারিবারিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিচেতনায় তার জটিল ছায়াপাত ঘটে। কখনো কখনো এরই প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস ও শ্রেয়োমার্গে দেখা দেয় অভূতপূর্ব বিপর্যয়, সাহিত্যের বিভিন্ন দিগন্তে পালাবদলের আবেগ;

অনাবিষ্কৃত ও অনালোকিত পথে যাত্রার প্রবণতা দেখা দেয়। এ-সম্পর্কে স্কট জেমস একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন -

> "Literature grows out of what has preceded and its holds much of its past with in itself, yet it is always starting again, standing poised for an instant and then preparing for a new forward into the dark."[১৫]

এই মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের রূপান্তর হয় দুটি কারণে, একটি হলো আভ্যন্তরীন অপরটি বাহ্যিক। বিশশতকের শুরুতে বাঙালিমানসে পরিবর্তনের পেছনে ছিলো সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবনার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা, আলিপুরদুয়ার বোমার মামলায় শ্রী অরবিন্দ গ্রেপ্তার, ১৯০৮ সালে প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের প্রাণদন্ড, বাঘাযতীন প্রভৃতির প্রভাব-পুষ্ট স্বদেশী আন্দোলন এবং ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো বিদেশী শাসকেরা। এতে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন গান্ধীজীর মতো নেতাও। কিন্তু যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে দেখা গেলো, ঐ প্রতিশ্রুতি আসলে ধাপ্পা। ভারতবর্ষ তো স্বাধীনতা পেলই না বরং তাদের কাঁধে অতিরিক্ত বোঝা চাপান হলো।

১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমস্ ফোর্ডের সংস্কার-পরিকল্পনা। তারপর সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি নিয়ে এলো রাউলাট অ্যাক্ট, দেশজোড়া বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলা তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। এর পর জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকান্ড এবং অবশেষে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা। ধীরগতি সামাজিক পরিবর্তনের ধারা এরই ফলে খরস্রোতা হয়ে উঠলো। স্থিতাবস্থার নিশ্চলতা বজায় থাকলো না। ব্যক্তি-চেতনায় ও সামাজিক সংবিদে দেখা দিলো অকল্পনীয় নতুনের ঈশারা। এই পরিবর্তনের জন্য

কেবলমাত্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে দায়ী করা যায় না। যুদ্ধের বিভীষিকা আমাদের জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করেনি - গ্রামে-গাঁথা-দেশে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা তখনো অটুট। উপনিবেশবাদ যখন তার নখদাঁত প্রকাশ করতে শুরু করলো, এই প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হতে লাগল। যার প্রভাবে জনজীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতার উন্মেষ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে যে অভিঘাত তৈরী হয় তার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হলো বিঘ্নিত। মন্টেগু চেমসফোর্ড পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক চাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। জাতির এই নির্বিশেষ অপমান অপ্রকাশের বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো।

স্বভাবতই জনজীবনের এই বেদনা সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে, ফলে উনিশ শতকীয় ভাবজগৎ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন বিশ্ববীক্ষার উদ্ভাসন হলো এই পর্বে। এর মধ্যে সুস্থ, সংহত, আদর্শ জীবনের ছবি পাই না, পাওয়া সম্ভবও নয়; কেননা জীবন যখন সংঘাত-ময়, প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে যখন বারবার আসে আঘাত, তখন পূর্বসূরীর স্থির বিশ্বাসে অবিচল থাকা সম্ভব হয় না। সত্য-শিব ও সুন্দরের পূর্বাগত ধারনায় তাই দেখা দিয়েছে সংশয়, আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে এসেছে বিভ্রান্তি। এক কথায় সর্বব্যাপী অবিশ্বাস ও নিরন্তর প্রশ্নের অভিঘাত তরুণ চিত্তকে উদ্বেলিত করেছে। এছাড়া ছিলো পরাধীনতার শৃঙ্খল-জনিত হীনমন্যতাবোধ।

এই বিক্ষুব্ধ বেদনা এবং নতুন প্রত্যাশাকে বাণীরূপ দেবার জন্য প্রমথ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হলো 'সবুজপত্র', এর প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ সালে - যাতে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো। ফলে মানুষের কাছে যুগের বিক্ষোভ, সংশয় ও উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা খুব স্পষ্ট ভাবেই ধরা পড়েছে। এরপর সাহিত্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভঙ্গি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'কল্লোল', এর কিছুদিনের মধ্যেই 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'উত্তরা', 'ধূপছায়া' ও 'সংহতি'র প্রকাশ ঘটে।

এই কল্লোলীয় তরুণেরা কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে নিজেদের মানস সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যে তখন জেম্‌স জয়েস-এর চেতনা প্রবাহ-মূলক উপন্যাসের চমকিত আবির্ভাব হয়েছে। সেই সঙ্গে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ডি, এইচ লরেন্স স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কল্লোলীয় তরুণেরা এঁদের দ্বারা উৎসাহিত হতে পারেন নি, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বক্তব্য' প্রবন্ধে লিখেছেন যে -

> "প্রমথ সেন ও ভোলানাথ সেন এই সময় থেকে আমাদের বিদেশী - বিশেষত রুশিয়ান, সুইডিশ, নরুইজীয়ান, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের খোরাক জোগাতে শুরু করেন।" [১৬]

অন্যদিকে এই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চিত মানুষের মনে অনেকটাই আশার আলো দেখিয়ে ছিলো রুশবিপ্লব (১৯১৭)। কেননা, গোপাললাল সান্যালের 'সমাজতন্ত্রবাদ' এবং সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর' অনুবাদ রুশ জাগরণের প্রভাব সূচিত করে। অবশ্য বাঙালির সঙ্গে রাশিয়ার আত্মিক যোগাযোগ অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে ছিলো। ধূর্জটিপ্রসাদ জানিয়েছেন রাশিয়ার সঙ্গে ১৯১০ সালের পর থেকেই বাঙালির একটি যোগ হচ্ছিলো। [১৭]

সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের উদাহরণ নয়, মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চেতনার ধাত একেবারে বদলে দেওয়ার এক সফল পরীক্ষাও বটে। ধূর্জটি প্রসাদ বলেছেন :

> "য়ুরোপের যুবক মনে যুদ্ধের প্রভাব যতটা ততটা প্রভাবই রুশিয়ান বিপ্লবের আমাদের দলের মনের ওপর। তার চেয়ে বেশী বললে অত্যুক্তি হয় না।" [১৮]

মূলত: শিক্ষিত বাঙালি যুব সমাজের মধ্যেই রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিলো, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁদেরই অন্যতম। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক আদর্শে, লেনিন যখন দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে

নিয়ে গেলেন তখন আমাদের যুব-সমাজ পরাধীনতার জ্বালা আরো গভীর ভাবে অনুভব করতে লাগলো। ফলে দেশের মধ্যে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দানা বেঁধে উঠলো। ১৯২১ সালের শেষ পাদে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফলে চিন্তাশীল মানুষদের মধ্যে নতুন চেতনার প্রতি অনুকূল মানসিকতা তৈরি হতে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রমিক-কৃষক জীবনের সমস্যা অবলম্বন করে বিভিন্ন পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশের সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয়েছে 'সংহতি' যা মূলত শ্রমিক জীবনের মুখপাত্র। নারায়ণ ভট্টাচার্য 'দিনমজুর' লিখলেন 'সংহতি'তে। এছাড়া প্রকাশিত হলো 'সাপ্তাহিক লাঙল', 'গণবাণী' ও 'গণশক্তি' পত্রিকা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী বিনয় সরকার সম্পাদিত 'গৃহস্থ' (১৯১১-১৫) এবং শ্রীরাধা কমলমুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' (১৯১৩-১৮)। ১৯২৪ সালের 'গৃহস্থ' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় শ্রী রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন - 'সোশিয়ালিজম' প্রবন্ধ। সেই সময় এই সব গণচেতনামুখী প্রবন্ধের প্রকাশ কিছুটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে সন্দেহ নেই।

এক কথায় শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমবেদনা, দ্বান্দ্বিক জড়বাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, পৃথিবীর অস্থির রঙ্গমঞ্চে নিপীড়িত মানবাত্মার ক্লিষ্ট আর্তনাদ এসে পৌঁছেছিলো। বাঙালি মানসে এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও তৎকালীন তরুণ লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলো। 'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোকুল নাগের 'পথিক' (১৯২৫) অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। কালিকলমের অন্যতম প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মিছিল' (১৯৩৩) উপন্যাসে দেশপ্রেমিক-দের জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের মন্তব্য স্মরণ করে বলতে হয় -

> "প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল বাংলাদেশের পক্ষে মোড় ফেরার কাল - জীবনচর্চায় ও মানসিকতায়।" [১১]

উনিশ শতকের সাহিত্যে নাগরিক ভাবনার উন্মেষ হলেও মূলত গ্রামীন সমাজের উপযোগী জীবনবীক্ষণই প্রধান, পরবর্তীকালে কল্লোলের যুগে মনোভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়ে দেখা গেলো নাগরিক পরিশীলনের ক্রমবর্ধমান অভিব্যক্তি। অর্থনৈতিক সংকট মানুষকে তখন চিরাগত জীবনভাবনার শিকড় থেকে প্রায় উৎখাত করে দিচ্ছিল। শিক্ষা ও জীবিকার তাগিদে আরো বেশি করে গ্রামীন মানুষ শহরমুখী হলো। এর সঙ্গে যুক্ত হলো আরো নানা উপসর্গ : ম্যালেরিয়ার অত্যাচার, কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকার প্রতি অনীহা, সংশয়ী মানসিকতা ও সমষ্টিচেতনার প্রতি ঔদাসীন্য। অচলায়তনের প্রতি নবলব্ধ সচেতনতার ফলে সাংস্কৃতিক আলো-বাতাস হীনতার জন্য যন্ত্রণাও লক্ষ করি। অপর দিকে শহরগুলির উপকণ্ঠে কলকারখানা গড়ে উঠার ফলে তার আশেপাশে জনবসতি বাড়তে থাকে। এদিক থেকে সবচেয়ে আকর্ষনীয় ছিলো কলকাতার দ্রুত উত্থান। নাগরিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে লাগলো ক্রমাগত।

এই সংকটময় যুগপরিবেশেই কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের আবির্ভাব। বিশেষ করে

> "কল্লোল-গোষ্ঠীর যাঁরা বিশিষ্ট লেখক কিংবা যাঁরা তাদের সমকালীন, সকলেরই কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাপর্বের ও তার অব্যবহিত পরবর্তী বাঙ্‌লা দেশে। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশ কালে (১৯২৩) এঁদের অনেকেরই বয়স পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে।" [২০]

কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের কবিতায় গল্পে ও উপন্যাসে নিপীড়িত, নির্যাতিত, শোষিত মানুষের যেরূপ ফুটে উঠেছে তা আমরা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাইনি। এদিক থেকে অবশ্যই তাঁরা আধুনিকতার দাবীদার হতে পারেন। যুবনাশ্ব রচিত 'পটলডাঙার পাঁচালী' নামক নাটিকায় আমরা পটলডাঙার অন্তেবাসীদের চিত্র পাচ্ছি। যার কুশীলব হচ্ছে কুঠেবুড়ি, নফর, ফকরে, সজি, গুবয়ে, নুলো আর খেঁদি পিসি। নাটকটির স্থান পটলডাঙার ভিখিরি পাড়া, প্যাচপেচে পাঁকের মধ্যে হোগলার কুঁড়ে ঘর। চরিত্র অনুযায়ী কথাবার্তা সংযোজন করা হয়েছে। সেখানে আঞ্চলিকতাই স্থান পেয়েছে। সেদিক থেকে

"বস্তিবাসী দারিদ্র্য-পীড়িত নীচুতলার মানুষের এমন মর্মন্তুদ ছবি যুবনাশ্বের আগে বাংলা সাহিত্যে কেউ লেখেন নি।" [২১]

অচিন্ত্যকুমার 'বেদে' উপন্যাসে জীবনের কুৎসিত দিকের প্রতি আলোকপাত করেছেন, এভাবে সমস্ত দিক থেকে একটা আলোড়ন তোলার উৎসাহ লক্ষ করা যায়। গোকুল নাগের 'পথিক', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পাঁক', বুদ্ধদেব বসুর 'সাড়া', 'ধূসর গোধূলি', 'যেদিন ফুটল কমল' ইত্যাদি এবং প্রবোধ কুমার সান্যালের গল্প উপন্যাসে। ব্যক্তির মুক্তি--পিপাসা, ব্যক্তির প্রেম-পিপাসা, ব্যক্তির দেহ-চেতনা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব-মূলত ব্যক্তির আত্মানুসন্ধানের প্রবণতা - এ যুগের বাংলা সাহিত্যে মুখর হয়ে উঠেছে। একদিকে যৌন মনস্তত্ত্বের অসংকোচ রূপায়ণ অন্যদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অভাব-অভিযোগের কথাচিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। বাস্তব তার এই দুটি উপাদানকে রবীন্দ্রনাথ "লালসার অসংযম" ও 'দারিদ্র্যের আস্ফালন' বলে ভৎর্সনা করেছেন। তবে পূর্বতন আদর্শবাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমরা তাঁদের রচনার বাস্তবতার নতুন মাত্রার বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি।

আসলে সেই সময়ের তরুণ লেখকবৃন্দ ইউরোপীয় সাহিত্যের যে আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন বাস্তববাদী আন্দোলন হিসেবে তাকেই সাহিত্য সমালোচকগণ চিহ্নিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে এই ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই বাস্তববাদী আন্দোলনের মধ্যে এমন কিছু উপাদান ও চেতনা ছিলো যার ফলে তরুণ সমাজের মনে তা এমনভাবে রেখাপাত করেছিলো।

এখন প্রশ্ন কী সেই অভিনব চেতনা ? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে অবশ্য আমাদের সংস্কার-মুক্ত মন নিয়ে বিচার বুদ্ধির দ্বারস্থ হতে হবে। বাস্তবতাবাদের অভিব্যক্তিতে চেতনার যে আলোড়ন নিহিত থাকে, তার স্বরূপ কী এই প্রশ্নেরই মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। ইংরেজি সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ বিচিত্র টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গৃহীত হয়েছিলো,

ইউরোপের অন্যান্য সাহিত্যের প্রভাব যেমন কার্যকরী ছিলো তেমনি স্বকীয় পথের প্রতি আনুগত্যও কম ছিলো না। এ বিষয়ে জন্ হলোওয়ে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন -

"More than once in the past, a period of comparative native independence has been succeeded by a period of major influence from continental Europe, this has been assimilated, and once again our literature has temporarily become more self-contained in its development."[22]

কিন্তু তরুণ সমাজ বাস্তববাদী আন্দোলনের মধ্যেই নিজেদের আবিষ্কার করতে পেরেছেন, কেননা তাদের যন্ত্রণা-দুঃখ সংশয়, অনিকেত মনোভাব এবং যৌন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাওয়া গেছে এই আন্দোলনের মধ্যেই। এর উল্লেখ আমরা বিনয় সরকারের রচনায় পাই -

"১৯শ শতাব্দীর ১৮৭০-৮০ পর্যন্ত ফরাসীদের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়ন যা, বিংশ শতাব্দীর ১৯০৫ সনের পরবর্তী বাঙলায় আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাঙন-গড়ন প্রায় সেই গড়ণের ও সেই বহরের বস্তু।"[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কথা-সাহিত্য ফরাসী দেশে উদ্ভূত বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো কিনা এটা বিতর্কের বিষয়। শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন ধরণের বাস্তবতার আবির্ভাব হয়েছে তা মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যে পাওয়া যায়,

"বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Ideal এর sentiment;রবীন্দ্র নাথের কল্পনায় Real ও Ideal-এর সমন্বয়ের চেষ্টা আছে, শরৎচন্দ্রের

কল্পনায় আছে Real- এর একটা emotional প্রতিরূপ। ... অতঃপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, শাদা চোখে Real এর সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হইবে তাহার একমাত্র প্রেরণা।" [২৪]

এই আন্দোলনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নতুন ধারণা গড়ে তোলা। এ সম্পর্কে George J. Beeker -এর মূল্যবান মন্তব্যটি করা যেতে পারে :

"Realism really did constitute a fresh start because it was based on a new set of assumptions about the universe." [২৫]

প্রমথ চৌধুরী 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' নামক প্রবন্ধে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে একটি ছোট্ট সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

১। ইউরোপীয় দার্শনিক জগতেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত, পরে তা সাহিত্য পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে।

২। ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এ-জাতীয় দর্শনের উদ্ভব।

অনেক সমালোচক বলেছেন যে বাস্তববাদী আন্দোলন প্রথমে দার্শনিক আন্দোলন হিসেবে এবং পরে সাহিত্যিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাববাদের দুটি প্রধান ধারা যথাক্রমে conceptualism এবং nominalism ; এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যই বাস্তববাদী দর্শনের আবির্ভাব। conceptualism মতবাদের মূল কথা হলো বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্পর্কিত যে ধারণা, তার অস্তিত্ব আমাদের মনে। বস্তু সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমরা মানস জগতে গঠন করি এবং সেই গঠিত ধারণা অনুসারে পার্থিব বস্তুর বিচার করি। অপর পক্ষে nominalism মতবাদ তুলনায় অধিকতর উগ্র ভাববাদ। পার্থিব বস্তুর কোন অস্তিত্বই এই মতবাদ স্বীকার করে না। যে বস্তুর ধারণা আমাদের মনের মধ্যে আছে সেগুলি বস্তুই নয় কতগুলি নামের যোগফল।

ভাববাদী দর্শনের এই মতবাদ দুটির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানান হয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে টমাস রীডের common sense school -এ। পরবর্তীকালে এই মতবাদ অর্থাৎ বাস্তবতাবাদী মতবাদ জগতে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে। কেননা, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যের আমূল পরিবর্তন, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার এবং ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত ডারউইনের Origin of species নামক গ্রন্থ এই মতবাদকে সম্পূর্ণ এক নতুন ভিত্তি-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। স্বভাবতই এই মতবাদ নিজেকে প্রথমত দার্শনিক জগতে এবং পরবর্তীকালে সাহিত্য আন্দোলনেও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের প্রবণতাগুলি হলো জীবনের প্রকৃত রূপচিত্রণ, মানুষের নির্মোকমুক্ত পূর্ণ চরিত্র উপস্থাপন এবং নৈর্ব্যক্তিক বস্তুধর্মিতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকগণ কেন বিশেষভাবে অন্ত্যজ শ্রেণীর চরিত্র অঙ্কনে অধিকতর আগ্রহী ? প্রথমত বলা যায় ভাববাদী ঔপন্যাসিকগণ রোমান্সের প্রতি আসক্তি-বশত যে উপন্যাস রচনা করলেন তাতে নিম্নস্তরের দূরের কথা সাধারণ মানুষের স্থানও অল্পই ছিলো। স্বভাবতই দীর্ঘকাল অবহেলিত এই সামাজিক শ্রেণীটি সর্বপ্রথম অতি তীব্র ভাবে বাস্তববাদী সাহিত্যিকদের বিচলিত করেছে। অন্যদিকে সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য প্রথমেই এই সব নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের প্রতি নজর পড়াই স্বাভাবিক, কেননা এই জাতীয় চরিত্র গুলি সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাদের মনের প্রবৃত্তির উপর ভদ্রতা ও সভ্যতার আবরণ খুবই কম। তাদের আচরণ বেশির ভাগই প্রবৃত্তি চালিত। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত মানুষের চরিত্র এতই জটিল যে তাদের সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা প্রায়ই দুষ্কর। আর এই জটিলতা-বর্জিত মানুষগুলি প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে বাস্তবতাবাদী ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলো। আর সাহিত্যিকগণ মনে করেন যে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক লোক যে ধরনের জীবন নির্বাহ করেন সেটাই সবচেয়ে বাস্তব। মপাসাঁ-ও অনুরূপ মন্তব্য করেন যে সাহিত্যিকদের অবশ্যই সাধারণ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

বাস্তববাদী উপন্যাসে ঘটনা সেই ভাবেই লেখা উচিত, জীবনে তা যেভাবে ঘটে। লেখক যেহেতু নেপথ্যে অবস্থান করেন, রচনারীতিও নতুন ভাবে পুনর্নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। পাঠকের দৃষ্টিকে কোনো একটি বিশেষ দিকে নিবদ্ধ রাখা উচিত নয়। অবশ্যই এই সাহিত্যে সৌন্দর্য-সৃষ্টির পুরোনো বিধানগুলি পরিত্যক্ত হয়। কারণ বাস্তবজীবন তো ছন্দোময় নয়। আর সৌন্দর্য-সৃষ্টির বিশেষ প্রবণতা লেখকের মানসিকতার বিশেষ দিকগুলি ফুটিয়ে তোলে, ফলে সাহিত্যে বস্তুধর্মিতা ক্ষুন্ন হতে পারে। এছাড়া সাধারণ মানুষের সঠিক আচরণকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহারে বাস্তববাদী সাহিত্যিকগণ শুচিতার প্রবণতাটিকে স্বীকার করতে চাইলেন না। রোমান্টিক যুগের সাহিত্যিকগণ যে সব শব্দ ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন, সেই শব্দগুলো এবার অনায়াসে ব্যবহৃত হতে লাগলো। প্রথম দিকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ছিলো, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পাঠক - অনুভব করলেন, যে শ্রেণীর চরিত্র উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার স্বরূপ উম্মোচনে এই ভাষা-ব্যবহার অত্যন্ত বাস্তব-সম্মত। অন্যদিকে কাহিনী-বিন্যাস এবং চরিত্র-চিত্রন সম্পর্কে যাবতীয় কৃত্রিম প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে। জীবন এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ-এর আরম্ভ এবং শেষ তেমন সুন্দর ভাবে হয় না। স্বভাবতই সাহিত্যে কৃত্রিম পদ্ধতিতে আদি-অন্ত যুক্ত নিটোল কাহিনী পরিবেশনে অনীহা দেখা গেলো। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধেও সেই একই ধারণা। বাস্তব-বাদী সাহিত্যিকগণ উপন্যাসে যে সব চরিত্রের সৃষ্টি করলেন তারা আমাদের অতি পরিচিত। তাই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাদের বংশ-পরিচয় বা মৃত্যু-সংবাদ জানানোর প্রয়োজন হয় না। পূর্বে উপন্যাসের একটা প্রধান প্রবণতা ছিলো কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে কিছু গুণ বা দোষের উপস্থাপনা। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তিগত প্রবণতার চেয়ে শ্রেণী-বাস্তবতার প্রকাশই অধিক কাম্য - তাই ঔপন্যাসিক কিছু দোষ বা গুণ দেখিয়ে পাঠক সমাজকে বিহ্বল করতে চাইলেন না। আর এর জন্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে একাধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চিন্তা তাঁরা করেছেন। ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী'-তে এই ধরনের তিনটি চরিত্র আমরা দেখেছি।

প্রতীচ্যের ভাবাদর্শপুষ্ট হয়ে উপন্যাসে ও অন্যান্য সাহিত্য-মাধ্যমে অভিনব সন্ধান শুরু হয়েছিলো বলে কল্লোল যুগকে 'সাহসের যুগ' বলা হয়। এই সাহসের মধ্যে নিহিত আছে রোমান্টিসিজমের সীমাতিযায়ী আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাই 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উন্মাদনা' প্রকাশের মধ্যে। যৌবনের এই বিচিত্র প্রবণতাকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন - মনীন্দ্রলাল বসু, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ এবং নজরুল ইসলাম।

মনীন্দ্রলাল 'রমলা' উপন্যাসে এবং 'জীবনায়ণ', 'মায়াপুরী'তে দাম্পত্য প্রেমের রহস্যের উন্মোচন করেছেন। তিনি অবশ্য দেহকামনাকে প্রশ্রয় দেননি। সেদিক থেকে গোকুল চন্দ্রের 'বসন্ত বেদনা' গল্পটি সার্থক সৃষ্টি। সুরভির অতৃপ্ত যৌবনের বুভুক্ষিত অন্তরের কামনা, দেহের তীব্র বাসনা ও বেদনাকে লেখক গভীর আন্তরিকতায় রূপ দিয়েছেন। নজরুল ইস্লামের 'ব্যথার দান', 'হেনা', 'ঘুমের ঘোরে' ইত্যাদি গল্পের নায়ক একদিকে যুদ্ধের প্রচন্ড বিভীষিকার মুখোমুখি হয়েছে। অন্যদিকে কামনার আগুনে তারা দগ্ধ হয়েছে তীব্রভাবে।

প্রচলিত সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিতে খুব বেশি দক্ষতা দেখা যায় নি। তারুণ্যের চাঞ্চল্য এবং রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতায় নিয়োজিত অধিকাংশ কল্লোলীয় সাহিত্যিকগণ যখন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অসংযত প্রকাশকেই সাহিত্যের মূলধন করে নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় জগদীশ গুপ্ত এক বিরল পরিণত এবং বাস্তবদৃষ্টির অধিকারী হয়ে সাহিত্যে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক আশ্চর্য নিরাসক্ত দৃষ্টি। এই দৃষ্টি এবং বস্তুধর্মিতাকে ফ্লবেয়ার বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ মনে করেছেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথও এই দৃষ্টিকে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে আদর্শ দৃষ্টি বলে স্বীকার করেছেন।

ভাষা-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও জগদীশ গুপ্ত সংযত মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। তার এই সংযমী আঙ্গিক চেতনা তাঁকে অনন্যতা দান করেছে। তাঁর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে কখনও যান নি। যে বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন সে বিষয় নিয়েই তিনি লিখেছেন এবং আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় একান্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবে লিখেছেন এবং তার মধ্যেই বক্তব্য এবং রুচি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কুলি-মজুরদের জীবন সম্বন্ধে তাঁর খুব বেশি অভিজ্ঞতা[২৬] ছিলো না, তাই তাদের নিয়ে তিনি 'শৌখীন মজদুরী' করেননি। তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিলো বিংশ শতাব্দীর বিত্তহীন বাঙালি সমাজ, অভাবক্লিষ্ট ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনায় নিপীড়িত এই শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু রূপটিকে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করতে পেরেছেন, একদিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে প্রাণ ধারণের তীব্র সংগ্রাম এবং অন্যদিকে ভদ্রতার অপদার্থ প্রয়াস - এই দুই বিপরীত তরঙ্গের আবর্তে গভীরতর মানুষটির অন্তরের যে কী প্রকৃতরূপ তা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিলো। তারই এক উজ্জ্বল চিত্র তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ সম্বন্ধে জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন -

> "তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অসঙ্গতিকে আঘাত করে মানুষকে মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।" [২৭]

জগদীশ গুপ্ত নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 'বেয়াড়া নাচ' নাচবার এক পূর্বাভাস তাঁর কবিতায় চিত্রিত করেছেন -

"আমি যেদিন জন্ম নিলাম অতি ভয়ঙ্কর
এমনি সব দুর্ঘটনা ঘটল পর পর
    মা বললেন : দুর্লক্ষণ
    দেখছি যেন অসাধারণ
এল কেটা ? এই ছেলেটা যদি থাকে বেঁচে
দেখে নিও নাচবে ও বেয়াড়া নাচ নেচে." [২৮]

এই 'বেয়াড়া নাচ' নেচেই তিনি সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অবশ্য তিনি শুধু নীতিবাদীর ভূমিকা পালন করেন নি, কেননা তাঁর মতে -

> "কথার দ্বারা অনুভূতি সংক্রমিত করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে ফলশালী করিয়া তুলিবার ভার মানুষের নিজের প্রয়োজন বোধের উপর।"[২৯]

আর সেইজন্যই তাঁর সাহিত্য কর্মে কোনটি সুন্দর, কোন্ বস্তুকে বর্জন করা উচিত - এ গুলি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় না। তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো - নিয়তি চেতনা। তাঁর ভাষায় -

> "ব্যাহত এই জগৎ পরাঙমুখীকৃত, তাকে পরিপূর্ণ সুখে পৌঁছে যেতে দেওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যৎ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুখে।"[৩০]

মানুষ নিরন্তর এই নিয়তিকে না মানার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে। কিন্তু অসহায় মানুষ তার সীমিত শক্তি দিয়ে তাকে উপেক্ষাও করতে পারছে না, নিয়তির এই নির্মম চিত্র তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশিষ্ট সমালোচক সুকুমার সেন তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন -

> "অসহায় মানুষের জীবনচক্র ঘুরিতেছে নির্মম নিষ্ঠুর হিংস্র অদৃষ্টের হাতে - ইহাই জগদীশ চন্দ্রের গল্পের অমোঘ নির্দেশ।"[৩১]

তাঁর উপন্যাসে অন্যতম বর্ণনীয় বিষয় হলো নারী চরিত্র এবং নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীকে তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বিভিন্ন উপন্যাসে সামাজিক স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখে বিভিন্ন সমাজের নারী চরিত্রের যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা অভূতপূর্ব। আবার জীবন-সংগ্রাম, দরিদ্র মানুষের জীবন, তাদের বঞ্চনা এবং নিষ্ঠুর নিয়তির অলঙঘনীয়তাও তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা যায় -

"কল্লোলের যা মূল বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত ছিল তা একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনাতেই অভিব্যক্ত। ... জগদীশ গুপ্তের দিকে না তাকালে মনে হয় কল্লোলের সমগ্র প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক পন্থাবিলাসে পরিসমাপ্ত।"[৩২]

শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার ইত্যাদি সাহিত্যিকদের রচনায় দেহজ প্রেমের গুরুত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বুদ্ধদেবের 'এরা, ওরা এবং আরো অনেকে' এবং অচিন্ত্যকুমারের 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' উপন্যাসগুলিকে একসময় সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। প্রবোধকুমার সান্যালকেও লালবাজারে উপস্থিত হতে হয়েছিলো।

তৎকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুসরণে তাঁরা যৌন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি ইত্যাদি পত্রিকার নবীন লেখকদের অমিতাচারের সমালোচনা করেছেন। ঐ বছরেরই অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে নবীন লেখকদের অভিনবত্বকে প্রশংসা করেও তাঁদের 'স্বেচ্ছাচারী প্রবণতাকে' তিরস্কার করতে কুণ্ঠিত হননি। রবীন্দ্রনাথ নান্দনিক শুচিতার সমর্থক ছিলেন বলেই তাঁদের 'বেআব্রুতা'কে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রও প্রথমদিকে নবীন লেখকদের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্যে অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি দেখে তাঁদের তিরস্কার করেছিলেন। এছাড়া শনিবারের চিঠির লেখকবৃন্দ - সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার ইত্যাদি - প্রথম থেকেই এদের বিরোধিতা করেছিলেন।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকবৃন্দ সাহিত্যে এ-যাবৎ যে সকল শ্রেণীর মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি, সেই সব অবহেলিত, শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের অবক্ষয় ও নিপীড়নের ছবি এঁকেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা ফ্রয়েডীয় মতবাদের প্রভাববশত নরনারীর নির্জ্ঞান

মনের কামনা-বাসনাকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে সুস্থ সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে বাধারও সৃষ্টি করেছিলেন। কল্লোলীয় বলয়ের বাইরে সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের বিশিষ্ট পথে বাস্তবতার নতুন নতুন মাত্রা আবিষ্কার করে উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও গ্রন্থনায় যুগান্তরের বার্তা বয়ে এনেছেন। তাঁদের সৃষ্টিতে লক্ষ করি কিভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা জটিল মৌলিক জিজ্ঞাসা আধুনিক মানুষের মনকে উদ্বেল করে তুলেছে। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি সংলগ্নতা-বোধ আবার অন্যদিকে অসহায় ব্যক্তির অসংলগ্নতার উপলব্ধি তাঁদের বিশ্ববীক্ষায় গ্রন্থিলতা যুক্ত করেছে, এনেদিয়েছে নিরন্তর প্রশ্নের আর্তি। আর এই অন্তহীন প্রশ্নের নেপথ্যে আছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা। বিশেষভাবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈজ্ঞানিক সত্য-সন্ধিৎসার কঠিন ব্রত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর রচনা ফ্রয়েডবাদ থেকে মার্কসবাদে উত্তরনের এক উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর বহন করে। নারায়ণ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন -

> "সমাজ বাস্তবতার এমন নিখুঁত ও সুদক্ষ কলাকার এখন পর্যন্ত বাংলা কথা-সাহিত্যে আর দ্বিতীয় আবির্ভূত হননি।" ৩৩

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি, 'দর্পন' ইত্যাদিতে কেবল সমস্যাই উত্থাপন করা হয় নি, তার প্রতিকারের পথও আভাসিত হয়েছে। তিনি ছিলেন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী নতুন জীবন-স্বপ্নে বিভোর আবার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর পিছুটানজনিত আততিতে ক্লান্ত।

কল্লোলের লেখকবৃন্দ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাঁদের লেখনীকে ব্যবহার করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অবশ্য এদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন - সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। শরৎচন্দ্র কল্লোলের লেখকদের তিরস্কার করে বলেছিলেন, তাঁরা কেন দেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁদের লেখনীর শক্তি প্রয়োগ করেন না ? দেশের মুক্তির আদর্শ কি তাঁদের চেতনাকে

অনুপ্রাণিত করে না ? পরাধীনতার বেদনা কি তাঁদের অন্তর স্পর্শ করে না ? তাঁরা ভাবছেন যে তাঁরা তাঁদের গল্পোপন্যাসে যৌনতার ছবি এঁকে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু আসলে এটা ভীরুতার পরিচায়ক, দায়িত্ব এড়ানোর নামান্তর। স্বাধীনতার পক্ষে কলম ধরলে ইংরেজকে চটাবার ঝুঁকি আছে, জেলে যাবার ভয় আছে, তাই সবাই নরনারীর দেহ চিত্রণে লেখার আবেগ ক্ষয় করবার কাজে উঠে-পড়ে লেগে ছিলেন, এ ধরনের পলায়নবাদ, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের ছলের ভিতর সাহসিকতার কণামাত্র প্রমাণ নেই।

শরৎচন্দ্রের এই তিরস্কারের মধ্যে আন্তরিকতা ও বস্তুবাদী চিন্তা লক্ষ করা যায়। তিনি কল্লোলীয় লেখকদের মানসিক প্রবণতা উদ্ঘাটন করে দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। রোমাণ্টিক উন্মাদনা ও নগর-চেতনা যখন কল্লোলের মূলসুর, ঠিক সেই সময় তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বাংলার শাশ্বত পল্লীজীবনের রূপকার হিসেবে আবির্ভূত হলেন। একজন বীরভূমের ভাগ্য নিয়ন্তা, অন্যজন নামে নিশ্চিন্দিপুর হলেও গ্রাম বাংলার হৃদয়ের প্রতীক হয়ে দেখা দিলেন। তারাশঙ্করের 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'চৈতালী ঘূর্ণি,' ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' এবং 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' - এর বিশাল জীবনস্রোতে যে প্রশস্তি রচিত হয়েছে, তা -

"ধনীর নয়, দরিদ্রের নয়, জমিদারের নয়, প্রজার নয়, মহিমাময় মানুষের"[৩৪]

বীরভূমের নিসর্গ প্রকৃতিকে তাঁর উপন্যাসে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুললেও তাঁর মূল মনোযোগের বিষয় ছিলো মানুষ। গর্কির মতো হাড়-হাভাতে বাউন্ডুলে ভবঘুরে চরিত্র যে তিনি কতো এঁকেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই।

অন্যদিকে পল্লীর অনাড়ম্বর জীবনের ভাষ্যকার বিভূতিভূষণের রচনায় প্রকৃতিও একটি মানুষী সত্তার মতো অনুভবী চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এর পাশাপাশি তিনি মর্মান্তিক

দারিদ্র্যের রিক্ততা ও শূন্যতার ছবি এঁকেছেন। 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক' - এই দুইয়ের বিশুদ্ধ চিত্র বিদ্যমান। 'অপরাজিত' উপন্যাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় - এক জায়গায় বিভূতিভূষণ অপুর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন -

"গরীবদের কথা ছাড়া লিখতে ইচ্ছা হয় না।" ৩৫

'কল্লোল'- পন্থীদের রচনায় আমরা পরিবর্তিত জীবন বোধ পাই ঠিকই কিন্তু সেই জীবনবোধ অনেকটাই আবেগতাড়িত, 'বিহ্বলভাববিলাস' ও 'অবাস্তব' রোমান্টিক চেতনায় আচ্ছন্ন। বিজ্ঞাননিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত তন্ময় দৃষ্টির দ্বারা মানুষের বিভিন্ন সমস্যার স্বরূপকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করে প্রকাশ করতে পারেন নি। সেদিক থেকে আমরা 'সবুজপত্র' পত্রিকাটির কাছে অনেকটাই ঋণী কেননা 'বিদ্যা বৈদগ্ধ্যের বাহন রূপে' পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যে নিজস্বতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

'বীরবলী ভাষা' রূপে কথিত সবুজপত্রের এই চলিত ভাষারীতি রবীন্দ্রনাথের উত্তর-জীবনকে প্রভাবিত করেছিলো। তবে চলিত ভাষা আন্দোলন ছাড়াও বুদ্ধিবাদের ক্ষেত্রে 'সবুজপত্রের' অবদান স্মরণীয়। সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন একজন মহাবিদ্বান ব্যক্তি - ইংরেজী, ফরাসী, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। স্বভাবতই তাঁকে এবং তাঁর পত্রিকাকে ঘিরে একটা চিন্তা-চর্চা ও সমালোচনার পরিবেশ গড়ে উঠেছিলো - যার প্রাণ ছিলো বৈদগ্ধ্য। যাঁরা এই পত্রিকাকে ঘিরে নিজেদের মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন - অতুলগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশ ঘটক, সুরেশ চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের রচনায় মূল বৈশিষ্ট্যই হলো মননশীলতা। ধূর্জটি প্রসাদের ত্রয়ী উপন্যাস বাংলায় চেতনা-প্রবাহরীতির প্রথম শৈল্পিক প্রয়োগের নিদর্শন। পরবর্তীকালে অন্নদাশঙ্কর রায়, গোপাল হালদার প্রমুখ এই ধারাকে বিকশিত করেছিলেন। এঁরা কল্লোলের কাছাকাছি থেকেও নতুন পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে ক্রমাগত নতুন মূল্যবোধ, নতুন চিন্তা চেতনার

অভিঘাত, আমাদের বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হলো, তার অনেক আগেই ফরাসী দেশের মৈত্রী, স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি সমাজের অগ্রণী ব্যক্তিদের স্পর্শ করেছে। বিশশতকের প্রথমে একের পর এক যুগান্তকারী ঘটনা, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ করে রাশিয়াতে লেনিন-এর নেতৃত্বে নতুন সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন হয়েছে। সেই সূত্রে মার্কস, এ্যাঙ্গেলস্, লেনিন-এর রচনাবলী এবং তাঁদের আদর্শের সঙ্গে আমাদের দেশের তরুণ সমাজ ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছেন। এই আদর্শের দ্বারা সবাই পরিচালিত হয়েছিলেন, এটা মনে করার কারণ নেই, কিন্তু বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবীদের মনে একটি দ্বন্দ্বের উদয় হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের প্রভাবে সাহিত্যের বাস্তবতা অন্যদিকে মোড় নিয়েছিলো। ফ্রয়েড এবং তাঁর শিষ্য ইয়ুং দুজনে মিলে যে নির্জ্ঞান তত্ত্বের প্রচলন করলেন তাতে জাগ্রত চেতনাই শেষ কথা নয়, অবচেতন মনের অতলান্ত প্রদেশে বহু অজানা ভাবনার সূত্র অনুসন্ধান করা যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে এই বিশ্বাস ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠলো যে আমাদের সচেতন চিন্তাই শেষ কথা নয়, সত্যের সবদিক দেখতে গেলে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে সেই অবচেতনার রহস্য যা আপাতদৃষ্টিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধূপছায়ায় মেদুর। ফলে ব্যক্তিগত চেতনা ও যৌথ নিশ্চেতনা এবং ব্যক্তিগত ও বস্তুগত অবস্থানের মধ্যে দ্বন্দ্বের জটিলে প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে ব্যক্ত হতে শুরু করলো। যদিও প্রাচীনকাল থেকেই এই আত্মতা ও বস্তুত্বের দ্বন্দ্ব ছিলো, বিংশ শতাব্দীতে এর চরিত্র বদলে গেলো অনেকটা। বিশশতকের দ্বিতীয় পাদে রচিত বাংলা সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই, একদিকে সমাজ পরিবর্তনের আবেগ অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জটিল অবচেতনের প্রকাশ; এই হলো চৈতন্যপ্রবাহরীতি উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিত, ইউরোপীয় সমাজের দ্বন্দ্ববিক্ষত পরিবেশে এর সূত্রপাত। বাংলার প্রতীচ্যমুখী বুদ্ধিজীবীর জীবনসন্ধানের প্রতি আগ্রহ এবং নিজস্ব সময়ের অনুশীলন-প্রয়াস থেকে উপন্যাসে নতুন আঙ্গিকের জন্ম হলো।

যাত্রাপথের শুরু থেকেই বাংলা উপন্যাস ইউরোপের নানা ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা জানি, ১৯২২ সালে এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ "The Waste land" এবং জেমস জয়েসের উপন্যাস 'Ulysses' প্রকাশিত হয়। হোমারের মহাকাব্য 'ওডিসি'র পুরকথাকে চব্বিশ ঘন্টার পরিধিতে আধুনিক জীবনের আধারে পুনর্বিন্যস্ত করে জয়েস উপন্যাসটি লিখেছেন। এর বয়নে অবচেতন এবং চেতনার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই বইটি পৃথিবীর সাহিত্যজগতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো। এর মধ্যেই 'চেতনাপ্রবাহরীতি' বা 'stream of consciousness' নামক যুগান্তকারী তত্ত্বের সূত্রপাত। এই ধারার আরেক বিশিষ্ট প্রবক্তা ভার্জিনিয়া উল্ফ। ক্রমশ ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার সাহিত্যে এর প্রতিষ্ঠা ঘটে। আমাদের দেশেও এর তরঙ্গাভিঘাত পৌঁছাতে দেরি হয়নি। স্বভাবত তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আর ধূর্জটিপ্রসাদ এদেরই অগ্রগণ্য। চৈতন্যপ্রবাহরীতির সাহায্যে উপন্যাসে তিনি মানবিক অনুভূতির সমগ্রতাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বহিরঙ্গ বাস্তবতা প্রসাধনের আড়াল মেনে নেয় বলেই সুসজ্জিত মিথ্যা এবং প্রগল্ভ মুখোশের অন্তরালে যে প্রকৃত সত্য রয়েছে তাকে জানাই বুদ্ধিজীবী জীবনসন্ধানী ঔপন্যাসিকের প্রধান দায়িত্ব।

উল্লেখপঞ্জী :

১. E.M.Forester : Aspects of the Novel, Penguin, New York, 1982 (1927) p.40.

২. দ্রষ্টব্য : অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৫ (১৯৬৬) পৃ.৩১০।

৩. সুশোভন সরকার, 'সমাজ ও ইতিহাস, কলকাতা, পৃ.১৫১।

৪. R.C. Mazumdar, Datta & Roy Choudhury, An Advanced History of India (1961 Edn.) p.636.

৫. Karl Marx : The First India war of Independence (1857-59), Moscow, Foreign Languages, Publ. House, 1959, p.34.

৬. অমিত সেন : ইতিহাসের ধারা, কলকাতা, ১৯৫৭ (৪র্থ সং) পৃ.৯

৭. বিনয় ঘোষ : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' (১ম) 'ভূমিকা', বীক্ষণ, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ.১৮।

৮. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'(১ম খন্ড), মন্ডল বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ.৩৪।

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খন্ড) 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' -বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ.৩৪-৩৫, ৩৮-৩৯।

১০. প্রাগুক্ত, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' পৃ.৬৩

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী : 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' - নিউ, এজ, কলকাতা, ১৯৫৭ (২য় সং) পৃ.৫৬।

১২. তদেব, পৃ.৫১

১৩. তদেব, পৃ.৪২

১৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক হাউজ, কলকাতা, ১৯৮৪ (৭ম সং) পৃ.২১-২২।

১৫. দ্রষ্টব্য : R.A. Schott. James, Fifty Years of English Literature (1900-1950), p.1.

১৬. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী (২য় খন্ড), 'নূতন ও পুরাতন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.১৮২-৮৩।

১৭. তদেব, পৃ.১৮২-৮৩

১৮. তদেব, পৃ.১৮২

১৯. অচিন্ত্য সিংহ রায়, 'কল্লোলের কাল', দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা, ১৯৮৭(১৯৭৩) পৃ.১২১

২০. গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.১৮২

২১. প্রাগুক্ত, কল্লোলের কাল, পৃ.১৪৬

২২. Boris Ford, The Modern age, London, Cassell & Co. Ltd.1964 p.52-53.

২৩. বিনয় সরকারের বৈঠকে (২য় ভাগ) পৃ.২২১।

২৪. মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৬৩(৬ষ্ঠ সং) পৃ.১৯৯

২৫. George M.Becker(ed), Documents of Modern Literary Realism (Princeton, N.J.1963). p.6.

২৬. দ্রষ্টব্য : সমরেশ মজুমদার, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ.২০১

২৭. দ্রষ্টব্য : যতীন সেন, ১৯৫৭ সালের ২৮শে এপ্রিলের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'জগদীশ গুপ্ত' নামক প্রবন্ধ।

২৮. জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত : 'নির্ভুল দৃষ্টি', (জগদীশ গুপ্তের নিজের হাতে দেওয়া তারিখ, ২৫।?।৫০)।

২৯. দ্রষ্টব্য : জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, 'কাশ্যপ ও সুরভী' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা।

৩০. দ্রষ্টব্য : তদেব, 'অচ্যুতানন্দের চিন্তা'।

৩১. সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (৪র্থ খণ্ড), ইস্টার্ণ পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৩৭৬ (১৯৫৮), পৃ.৩৪১

৩২. দ্রষ্টব্য : বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর 'জগদীশ গুপ্ত পরিচিতি'।

৩৩. নারায়ণ চৌধুরী, উত্তর-শরৎ বাংলা উপন্যাস, বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ.৪১

৩৪. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার কালের কথা', বেঙ্গল পাবলিসার্স, কলকাতা, ১৯৫১, পৃ.২১৭

৩৫. দ্রষ্টব্য : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপরাজিত', কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৪৬